পিপিপি: জমিজমা, ভূ-সম্পত্তি দাও আমরা উন্নত জিডিপি দেবো

অতনুশাসন মুখোপাধ্যায়

(আমার কৈফিয়ৎ— ইংরেজি চালু শব্দগুলির বাংলা প্রতিশব্দ আমি সাধারণভাবে খোঁজার চেষ্টা করিনি। আমার কানে— এবং আমার বিশ্বাস বেশির ভাগ মানুষেরই— 'নিরীক্ষা'র তুলনায় 'অডিট' অনেক বেশি স্বাভাবিক। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ স্টেশন শব্দের একটা বাংলা সমার্থক আবিষ্কার করতে পারতেন না— এমনটা নয় নিশ্চয়ই। তাঁর কানেও তো— ইস্কুল, ইস্টেশন উপযুক্ততর মনে হয়েছিল।)

গোড়ার কথা

গত মে মাসে (মে, ২০১৩) কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল পদে পাঁচ বছরের মেয়াদ শেষ করে অবসর নেওয়ার সময় বিনোদ রাই দুটি অভিমত প্রকাশ করেছিলেন যা খবরের কাগজে বহু লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকবে। তাঁর মন্তব্য দুটি ছিল এরকম— পিপিপি (পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ) প্রতিষ্ঠানগুলি সিএজি অডিটের আওতায় আসা উচিত এবং এর জন্যে সিএজি আইনের বদল হওয়া প্রয়োজন। টেলিকম, টুজি, কোল-গেট ইত্যাদি নিয়ে গত কয়েক বছর ধরে যে হৈ চৈ চলে আসছে— সেসব-ই ঘটলো একদিক থেকে ইন্ডিয়ান অডিট অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্ট-এর পর্যবেক্ষণের ফলশ্রুতিতে। এহেন ইন্ডিয়ান অডিট অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্ট-এর সর্বোচ্চ পদ থেকে অবসর নেওয়া ব্যক্তির পিপিপি প্রতিষ্ঠানগুলিকে ঘিরে এমন একটা মন্তব্য এই প্রতিষ্ঠানগুলির স্বচ্ছতার প্রতি এক ধরনের অনাস্থা কি?

বেসরকারি পুঁজিপতি স্বাগত বৈ কী?

নয়া উদারনৈতিক অর্থনীতির মূল কথাগুলির মধ্যে অন্যতম, সরকারের কাজকারবার থেকে ক্রমশ পশ্চাদপসরণ এবং মুক্ত বাজার অর্থনীতির উপর আস্থা স্থাপন। এতেই নাকি ঘটবে অর্থনৈতিক বৃদ্ধি, উন্নয়ন। এর মধ্যে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কথাও উঁকি ঝুঁকি মারে— প্রতিদ্বন্দ্বিতা। উঁকি ঝুঁকি মারে শব্দদুটো ভেবেচিন্তেই ছুঁড়ে দিলাম। কারই বা অজানা বড় বড় কর্পোরেট সংস্থা আপোসে পরস্পর পরস্পরকে ব্যবসার ক্ষেত্র ছেড়ে দেয়? দুর্জনেরা তো

এমনও বলে থাকেন নিজেদের নিজেদের কর্তৃত্ব দুই ভূখণ্ডে বজায় রাখার উদ্দেশ্যে ইস্পাহানি আর বিড়লা গোষ্ঠী সেই সাতচল্লিশ সালে দেশভাগেও মদত দিয়েছিল। সুতরাং ব্যবসাদারদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা কতটা যে আসল আর কতটা মেকি বোঝা ভার। ব্যাপারটা ওই উঁকি ঝুঁকি মারারই সামিল, কে কখন কার সঙ্গে জোড়ে, জোড় ভাঙে— এই আর কী। মোটের উপর নয়া-উদারনৈতিক অর্থনীতিবিদদের চিন্তা অনুযায়ী খোলা বাজারে সবাইকে যুদ্ধে নামাও। স্বাধীন যোদ্ধাদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে বাড়বে দক্ষতা আর দক্ষতার হাত ধরে এসে পড়বে উন্নয়ন। ব্যবসা, মূলধন, বিনিয়োগ ছুটে আসুক পৃথিবীর যে কোনো প্রান্ত থেকে, অর্থনীতির বৃদ্ধি হোক দ্রুততর, দারিদ্র্য মোচনের পথ সুগম হোক। উপরের স্তরের বিকাশের স্বাভাবিক নিম্নগামী বিন্দু বিন্দু ক্ষরণের প্রক্রিয়া থেকে নিচের স্তর পেয়ে যাক পুষ্টির উপাদান। এখন মাঝপথে যদি বৈষম্য দেখা দেয় অর্থনৈতিক স্তরভেদে, তাতে ধৈর্য হারালে চলবে না। মনে রাখতে হবে যার আছে— তার আছে বলেই তো সে ঢালতে সক্ষম, আর তাতেই তো যার নেই সোজা বা ঘুরপথে তার ঘরও ভরবে। এত সব মানবদরদী ভাবনার মধ্যে আরও একটা ব্যাপার— সরকারি ব্যবস্থাপনাকে যেখানে যেখানে সম্ভব বেসরকারি হাতে তুলে দাও, সে সাধারণ বিষয় বা বস্তু সম্পর্কিত ক্ষেত্রই হোক অথবা সামাজিক মূল্যের বিচারে স্পর্শকাতর ক্ষেত্র। কারণ— হ্যাঁ, এই কারণটাই বড় প্রবল এবং প্রচারিত— সরকারের হাতে টাকা নেই। ওদিকে আবার সরকারি কাজ কারবারে সরকারি সংস্থার ভূ-সম্পত্তিতে থাবা বসাতে পারলে উন্নয়নশীল অর্থনীতির উপর প্রভুত্ব কায়েম করা যায়, এটা ভালভাবেই বোঝা হয়ে গেছে উন্নত দেশে ক্রমশ গুটিয়ে আসা বাজারের কারবারিদের। অতএব তৃতীয় বিশ্বের সুবৃহৎ বাজার দেখে নেমে আসে দেশী-বিদেশী-বহুজাতিক বেসরকারি সংস্থা। সরকারের তরফে আহ্বান আর তাদের তরফে সাড়া— ঘটে যায় দুয়ের মেলবন্ধন। এভাবেই ভারতবর্ষের উন্নয়নশীল অর্থনীতির বাজার উন্মুক্ত হয়। জমা পড়ে একের পর এক সরকারি অথবা আধা-সরকারি সংস্থা বিলগ্নিকরণের প্রস্তাব।

এখন যে মেলবন্ধনের কথা বলা হল এর পিছনে কারণটা ঠিক কী? পরিকাঠামোর কথাই ধরা যাক। ভারতবর্ষের বিদ্যুৎ উৎপাদন বা বণ্টন ব্যবস্থা নিয়ে সত্যি সত্যি যথেষ্ট দুশ্চিন্তার কারণ আছে। এখনও ভারতবর্ষের জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ বিদ্যুৎ-এর সংস্পর্শ থেকে বহু দূরে। শুধু বিদ্যুৎ নয় পরিকাঠামোর অন্য ক্ষেত্রেও যেমন জল সরবরাহ, নিকাশী ব্যবস্থা জঞ্জাল অপসারণ, পরিবহন— এরকম অসংখ্য দিকে ভারতবর্ষের সামাজিক চিত্র প্রকৃত অর্থে ভয়াবহ। আজকাল খুব বলা হয়ে থাকে ভারতের উচিত চীনের পথ অনুসরণ করা এবং পরিকাঠামো-কেন্দ্রিক সমস্যার সমাধান চীনের আদলে করা। কী সেই পথ? বেসরকারিকরণ— চীন যা করেছে বিদ্যুৎ-এর ক্ষেত্রে এবং প্রভূত উন্নতি করেছে। বাস্তবে যে চীন-এর অস্তিত্ব নেই এটি আসলে তারই চিত্রকল্প। ভারতবর্ষ এবং চীন দু দেশেই বিদ্যুৎ সংস্থা সরকারি নিয়ন্ত্রণে এবং দুটি দেশেই বেসরকারি সংস্থাকে এক্ষেত্রে কোনো কোনো কাজে লাগানো হয়। ভারতবর্ষের সঙ্গে চীনের দৃষ্টিভঙ্গীর তফাৎ একদিকে বিনিয়োগে (আসলে চীন সরকার অনেক অনেক বেশী অর্থ ঢেলেছে) এবং অন্যদিকে সরকারি কর্মক্ষেত্রে সর্বস্তরে

কর্তব্যপরায়ণতা ও দায়িত্ব কঠোরভাবে প্রয়োগ করায়। শুধু বিদ্যুৎ নয় পরিকাঠামোর অন্যান্য ক্ষেত্রেও চীন সার্থকভাবে এই নীতি অনুসরণ করেছে। পরিকাঠামোয় সব কাজ বেসরকারি হাতে হওয়ার নয়। প্রত্যন্ত গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে দিতে যা খরচ, বেসরকারি সংস্থা তা বহন করতে প্রস্তুত থাকবে না কারণ সে টাকা উসুল করা সোজা নয়।[১]

দেখেশুনে মনে হয় এত সব খতিয়ে দেখার যত না প্রয়োজন তড়িঘড়ি উন্নয়নের নামে কিছু একটা করে বসার তাগিদ তার থেকে বেশি। কারণ, সংস্কারের নতুন অর্থনীতি কীসে কী হবে জলের মতো পরিষ্কার করে দেখিয়ে দিয়েছে। যোজনা কমিশন, কমিটি অন ইনফ্রাস্ট্রাকচার সবাই ধরেই নিয়েছে টাকা যখন সরকারের নেই, বেসরকারি পুঁজিপতিকে আহ্বান করা উন্নয়নের পাকা ভিত গড়ার জন্যে প্রথম সোপান। ১৯৯৭ সালে পরিকাঠামো নিয়ে রাকেশ মোহন কমিটির সুপারিশ আগেই ক্ষেত্র প্রস্তুত করে রেখেছিল। বেসরকারিকরণ এবং বেসরকারি উদ্যোগকে উৎসাহ প্রদান কমিটির সুপারিশ মোতাবেক সরকারের পক্ষে গ্রহণীয় পন্থা। এরকম ভাবনা থেকেই সূচনা হল যৌথ উদ্যোগের— সরকারি-বেসরকারি অংশীদারী (Public-Private Partnership) সংস্থার, আমাদের এই আলোচনায় আগাগোড়াই যাকে আমরা পিপিপি নামে চিহ্নিত করবো।

সরকারি মহলে এবং বাইরে অনেকেই একমত ছিলেন উন্নয়নের সম্ভাবনা ধরে রাখতে গেলে পরিকাঠামোর বড় ধরনের ঘাটতি থাকলে চলবে না। একাদশ পরিকল্পনার মেয়াদকালে (২০০৭-২০১২) অন্তত ৯ শতাংশ হারে জিডিপি-র বৃদ্ধি প্রয়োজন বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল। এশিয়া মহাদেশের দ্রুততালে আগুয়ান অন্যান্য দেশের অর্থনীতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হলে একাদশ পরিকল্পনার মেয়াদকালের শেষ দিকে পরিকাঠামোর জিসিএফ (গ্রস ক্যাপিটাল ফর্মেশ্যন) জিডিপি-র ১১ শতাংশর কাছাকাছি দরকার বলে হিসাব করা হয়। যোজনা কমিশনের হিসাব-নিকাশ অনুযায়ী একাদশ পরিকল্পনার মেয়াদকালের শেষ বছরে (২০১১-১২) জিসিএফ, জিডিপি-র ৯%-এ এবং দ্বাদশ পরিকল্পনার মেয়াদকালের শেষ বছরে (২০১৬-১৭) ১০.২৫%-এ পৌঁছবে। এই অনুমান অনুযায়ী দ্বাদশ পরিকল্পনার মেয়াদকালের শেষে একাদশ এবং দ্বাদশ পরিকল্পনার মেয়াদকাল মিলিয়ে দেশের পরিকাঠামোয় মোট বিনিয়োগ গিয়ে দাঁড়ায় ষাট লক্ষ সাতান্ন হাজার এগারো কোটি টাকায়। এই বিপুল পরিমাণ অর্থ আসবে কোথা থেকে? একাদশ পরিকল্পনার মেয়াদকালে প্রয়োজনীয় অর্থের ৩২ শতাংশ টাকা বাজেট অনুদান থেকে দেওয়া সম্ভব বলে হিসাব করা হয়েছিল। বাকিটা মূলত বেসরকারি সংস্থার বিনিয়োগ এবং রাষ্ট্রায়ত্ত কর্পোরেট সংস্থার অভ্যন্তরীণ ও অতিরিক্ত বাজেট সংস্থান (Internal and Extra-Budgetary Resources – সংক্ষেপে IEBR) থেকে সংগৃহীত হওয়া প্রয়োজনীয় ছিল। এখন প্রকৃত মঞ্জুরী দানের সময় দেখা গেল কেন্দ্র, রাজ্য, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার IEBR— সবার মিলিত সংগ্রহের পরেও ৩০ শতাংশ টাকা ধার করতে হয়।[২] একাদশ পরিকল্পনার মেয়াদকালের এই চিত্র থেকে দ্বাদশ পরিকল্পনার মেয়াদকালের অবস্থান কীরকম হতে পারে— এ সম্বন্ধে একটা আন্দাজ পাওয়া যাচ্ছে। টাকার উল্লিখিত অঙ্কগুলি থেকে বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না— পরিকাঠামো খাতে দেশ জুড়ে কী বিপুল

অর্থের লেনদেন চলছে এবং ভবিষ্যতেও চলতে থাকবে— যেখানে সরকারের ভূমিকা যত না, বেসরকারি সংস্থার এবং উত্তমর্ণের ভূমিকা তার কয়েক গুণ বেশি। এবার প্রশ্ন— সরকার বাদে বাকিরা তাহলে কি দান-ধ্যানে নেমে পড়েছে নাকি গণেশ ঠাকুরের মূর্তিটা ঠিক কতটা উঁচু দেখাতে গিয়ে নিচের হাতটা অদেখা থেকে যাচ্ছে? সরকারের পক্ষে বক্তব্য— আমার টাকা নেই— কিন্তু ক্রমবর্ধমান বাজারদরের মহার্ঘ জমি আছে— এখানে তোমরা টাকা ঢালো, আমিও ঢালবো, তোমরা ঢালো কিছু বেশি, দেশের সম্পদ তৈরি হোক— জিসিএফ বাড়ুক— জিডিপি বাড়ুক— পরিকাঠামোয় নতুন নতুন অভিমুখ টেনে আনুক নতুন নতুন বিনিয়োগ— আরও কর্মসংস্থান— আরও উন্নয়ন— দেশের মান বাড়ুক। এমনটাই স্বপ্ন নব্য উদারনৈতিক রাজনীতিকদের। এখন প্রশ্ন, তাদের দ্বারা চালিত সরকার যদি মহার্ঘ জমিই প্রকল্পে দান করে বসলো, সরকারের সাকুল্যে বিনিয়োগটা আর কম হল কোথায়? তাহলে সরকার তার হিসেবটা ঠিক ঠিক বুঝে নিচ্ছে তো? Private Participation in Infrastructure (PPI)-এর উপর বিশ্ব ব্যাঙ্কের রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০১১ সালের প্রথম ছমাসে উন্নয়নশীল দেশগুলির সামগ্রিক বেসরকারি পরিকাঠামোগত বিনিয়োগের অর্ধেকের উপর বিনিয়োগ কেবলমাত্র ভারতবর্ষেই হয়েছে। রিপোর্টে আরো বলা হয়েছে, উন্নয়নশীল অর্থনীতির বেসরকারি পরিকাঠামোগত বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ বৃহত্তম বাজার। দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলে আঞ্চলিক বিনিয়োগের শতকরা ৯৮ ভাগ ঘটেছে ভারতে এবং এই সমগ্র অঞ্চলের সর্বমোট চুয়াল্লিশটি প্রকল্পের মধ্যে তেতাল্লিশটি স্থাপিত হয়েছে ভারতের মাটিতে। ভারতবর্ষে পিপিপি নির্মাণের প্রবণতা বিশ্ব ব্যাঙ্কের এই তথ্য থেকে পরিষ্কার হবে।[৩]

সরকার বস্তুটা কী? সেটা কি চালাক-চতুর একটা পদার্থ? নাকি বোকাসোকা জড় একটা? এই তো বছর আষ্টেক আগের কথা। রাজভবনের নাকের ডগায় সরকারি একটা হোটেল চলছিল। তার জমি পাঁচ-পাঁচ বিঘের উপর আর তার বাড়ি গুঁড়িয়ে মাটিতে ফেলে দিলেও পুরনো বাড়ির লোহা-লক্কড়, বার্মা-টিকের দরজা-জানলা আসবাব— বেশ কিছু কালোয়ার পরিবারের কয়েক পুরুষ গুছিয়ে বসার ব্যবস্থা করে দেবার জন্য যথেষ্ট। না, সরকারকে বাহবা না দিয়ে উপায় নেই। সরকার হোটেল বিক্রী করেনি। শতকরা দশ ভাগ অংশীদারী রেখে দিয়েছে (সেটা অবশ্য ধরে রাখতেই হবে এমন কোনো আইনি কড়াকড়ি নেই) ৯০% মালিকানার মূল্য ৫২ কোটি টাকা। কর্মচারীদের বাবা-বাছা বলে তো আগেই বিদেয় দেওয়া গেছে। তাহলে বিক্রী করে দিলেই তো ৫২ কোটি টাকার কিল হজম করে কবে ১০%-এর মালিকানার জেরে প্রচুর লভ্যাংশ কোযাগারে পোরা যাবে এমন স্বপ্নে মশগুল থাকতে হোত না। রাজভবন পাড়ায় একশ কাঠার উপর জমি। দরটা কেমন হোত? আট বছর আগের হিসেবই নয় কষতে বসি। অথচ পেলাম মাত্র ৫২ কোটি। সম্পত্তির মূল্য কম করে দেখাবারও তো একটা সীমা থাকবে। হোক না টেন্ডারের সর্বোচ্চ দাম। সরকার বিক্রী করতে পারে না— এমন একটা নীতির বড়াই করেই কি তবে এই জড়তা?

ঘরের পাশের আগাছাটাও চোখে পড়ে কিনা তাই দূরে দূরে ছড়িয়ে থাকা মহীরূহের প্রসঙ্গে যাবার আগে এই প্রসঙ্গটা একটু ছুঁয়ে যাওয়া।

পিপিপি'র স্বরূপ

আলোচনার বিষয় ছিল সরকারি-বেসরকারি অংশীদারী প্রকল্প (পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ প্রজেক্ট— সংক্ষেপে পিপিপি প্রজেক্ট)। বেসরকারি প্রকল্পে যেমন মূল্য ঠিক হয় প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে এবং কোনো সরকারি সম্পদ সেখানে থাকে না, সরকারি-বেসরকারি অংশীদারীর ভিত্তিতে গঠিত পরিকাঠামো প্রকল্পে (পিপিপি) জাতীয় সম্পদ হস্তান্তরিত হয়, সরকারের কর্তৃত্ব থেকে হস্তান্তরিত হয় সেবার বিনিময়ে মূল্য উদ্ধারের ক্ষমতা, সেবার ব্যাপারে একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠাকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা এবং ন্যস্ত হয় সরকারের তরফে ঝুঁকি এবং দায় নেবার ভাগীদারী। গ্রাহকের স্বার্থ এবং জাতীয় অর্থের সুরক্ষার প্রয়োজন এই প্রকল্পগুলিতে আরও বেশি গুরুত্ব দাবি করে। ("Unlike private projects where prices are generally determined competitively and government resources are not involved, PPP infrastructure projects typically involve transfer of public assets, delegation of government authority for recovery of user charges, private control of monopolistic services and sharing of risks and contingent liabilities by the government. Protection of user interests and the need to secure value for public money, as such, demand a more rigorous treatment of these projects")[৪]— এই হল পিপিপি সংক্রান্ত মূল কথা। পিপিপি প্রকল্পে বেসরকারি অংশীদার মূলধন ঢালবে আর সময়মতো বাজেট-এর অঙ্কের সীমার মধ্যে প্রকল্পের কাজ শেষ করতে যে নৈপুণ্য প্রয়োজন তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে দক্ষ মানুষজনকে কাজে লাগাবে। সরকারি অংশীদারের দায়িত্ব সর্বসাধারণের জন্যে সেবাদান এবং জীবনযাত্রার মানবৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, বেসরকারি শিল্পমহল ইদানীং পিপিপি-তে বিনিয়োগ করায় অত্যুৎসাহী। এর কারণ সহজেই অনুমেয়। যখন লভ্যাংশ ভাগাভাগির সময় আসবে, বেসরকারি অংশীদার তার পাওনাগণ্ডা বিনা বাধায় পেয়ে যাবে কারণ পিপিপি সংস্থার প্রশাসন তারই নিয়ন্ত্রণে। অথচ প্রকল্পে সরকারের অংশ থাকায় সরকারের নাম ভাঙিয়ে বিভিন্ন ধরনের মঞ্জুরী বা অনুমোদন পিপিপি সংস্থার আয়ত্তাধীন হওয়া অনায়াসে সম্ভব। প্রকল্পর লক্ষ্যপূর্ণ সমাপ্তি এবং অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে তা গড়ে তোলার যৌক্তিকতা প্রাথমিকভাবে সরকারের মদতের উপরেই নির্ভরশীল। প্রকল্পের মেয়াদ বা চুক্তি শেষ হলে পিপিপি উদ্যোগের সৃষ্ট সম্পদের মালিকানা সরকারি অংশীদারের অধিকারে চলে আসতে পারে, আবার নাও আসতে পারে। পিপিপি উদ্যোগের কয়েক ধরনের নমুনার কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। BOT (Build, Operate and Transfer), LOT (Lease, Operate and Transfer), BROT (Build, Rehabilitate, Operate and Transfer), BLT (Build, Lease and Transfer), BOOT (Build, Own, Operate and Transfer), BOO (Build, Own, Operate), DBFO (Design, Build, Finance and Operate), DBFOM (Design, Build, Finance, Operate and Maintain) ইত্যাদি। এইসব ধরনের পিপিপি সংস্থা গঠন করা হয় যেখানে একটা নতুন পরিকাঠামোগত সম্পত্তি তৈরি হয় পিপিপি প্রকল্পের মূল

ভিত্তি হিসাবে। এছাড়া কেবলমাত্র ব্যবস্থাপনার জন্যে চুক্তিভিত্তিক পিপিপি উদ্যোগও দেখা যায়। সরকারি সংস্থার কোনো কোনো অংশের কাজ যেমন নিজেদের লোকের অভাবে চুক্তির ভিত্তিতে বাইরের একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে দিয়ে করিয়ে নেওয়া হয় (Outsourcing), শেষোক্ত এই PPP উদ্যোগ অনেকটা সেরকম। আমাদের বর্তমান আলোচনায় এই ধরনের PPP উদ্যোগের তেমন প্রাসঙ্গিকতা নেই, কারণ আমাদের আলোচনার প্রধান উপজীব্য জনসাধারণের জন্য সৃষ্ট সম্পদের শেষমেষ হাল কী দাঁড়ায় সেই বিষয়টির অনুসন্ধান। উল্লিখিত PPP উদ্যোগের নানা প্রকারের মধ্যে প্রথম দিকের উদ্যোগগুলিতে (যেখানে যেখানে উদ্যোগের চারিত্রিক ধরনের শেষে 'Transfer' শব্দটি আছে) অংশীদারিত্বর মেয়াদ-শেষে সৃষ্ট সম্পদ সরকারি অংশীদারের হাতে প্রত্যর্পিত হয়। PPP উদ্যোগে একটি সংস্থার জন্ম হয় যার চারিত্রিক নাম Special Purpose Vehicle (SPV)। সরকারি অংশীদারের মালিকানা এক্ষেত্রে যে কোনো অনুপাতে হওয়া সম্ভব। যদি তা শতকরা পঞ্চাশ ভাগের বেশী হয় তবে SPV-কে সরকারি সংস্থা বলতে হয়, এবং শতকরা পঞ্চাশ ভাগ বা তার কম হলে, সংস্থাটি বেসরকারি সংস্থা হয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে সেই SPV সংস্থাটি আর সরকার, পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটি, পাবলিক আন্ডারটেকিং কমিটির কাছে দায়বদ্ধ থাকে না। কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল-এর অডিটও সংস্থার উপর প্রযোজ্য হয় না। এই প্রসঙ্গে— Guidelines for establishing Joint Venture in infrastructure project involving Public Private Partnerships (Secretariat for the Committee on Infrastructure, Planning Commission, Government of India – প্রকাশিত) এর ৭.২ পরিচ্ছেদের কথাগুলি প্রণিধানযোগ্য— সরকারি সংস্থার মালিকানার অংশ যৌথ উদ্যোগে শতকরা ৫০ ভাগ বা তার কম রাখা হয় প্রায়শ, যাতে যৌথ উদ্যোগটির বাণিজ্যিক স্বাধীনতা বাড়ে। এর অর্থ— যদিও সরকারি কোষ থেকে মূলধন ঢালা হবে, সরকারের যৌথ উদ্যোগের প্রত্যক্ষ পরিচালনায় কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকবে না। মাথায় রাখতে হবে, এমন হলে তবেই বেসরকারি অংশীদার উদ্যোগটিকে আকর্ষণীয় মনে করবে কারণ সরকারের টাকাও রইল, সাহায্যও রইল, কিন্তু তার কাছে জবাবদিহির প্রশ্ন রইল না। আবার সরকারি বা আধা-সরকারি সংস্থার পরিচিতিতে এই উদ্যোগ যদি সরকারি ক্রেতার সব সুবিধে নিতে যায়, সেটাও বাঞ্ছনীয় নয়। উদ্যোগ গড়ার সময়ে সে সম্ভাবনার রাস্তা আগেভাগেই বন্ধ করে দিতে হবে। ("The share of public sector entity is often kept at 50 per cent or less so as to enable the JV to function as a private sector entity with greater commercial freedom. However, this implies that though the public exchequer would contribute to the equity of such an enterprise, it would hardly exercise control over its functioning. It should be borne in mind that private sector entities would find such a JV to be more attractive as it would provide them with government funds and support without any accountability as noted above. It could also give them an undue advantage in government procurement as a JV would often be perceived

to be a government or a semi-government company. Such possibilities of undue advantage or vitiating of the government procurement process should be identified and eliminated in case a JV is proposed to be formed.") উদ্ধৃতির বিষয়বস্তু থেকে কতকগুলো প্রশ্ন উঠে আসে। যে যোজনা কমিশন নিজেই সরকারের একটি অংশ সরকারি ব্যবস্থায় সে-ই এতটা অনাস্থা পোষণ করে যে তাকে খোলাখুলি ঘোষণা করতে হয় সরকারি বিনিয়োগ সত্ত্বেও সরকারি নিয়ন্ত্রণ এড়িয়ে চলার জন্যে সরকারের মালিকানার অংশ শতকরা পঞ্চাশ ভাগ বা তার কম রাখতে হয় সচরাচর। অর্থাৎ দেশের যাবতীয় সরকারি ব্যবস্থা এতটাই নড়বড়ে এবং ভাল কাজের পরিপন্থী যে বেসরকারি অংশীদারের আস্থাভাজন হওয়ার জন্যে সেই নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখানোই সমীচীন। সরকারি নিয়ন্ত্রণের া রাখার অর্থ আসলে পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটি, পাবলিক আন্ডারটেকিং কমিটি, সিএ.জ— মূলত এদের আওতার বাইরে রাখা। তারা যদি প্রকৃতই এত গতিরোধক, বিকাশ-যাত্রার অন্তরায়, জগদ্দল আপদ বিশেষ— তবে সরকারি এই ব্যবস্থাপনাগুলোকে গুটিয়ে নেবার সুপারিশই বা হয় না কেন? তাহলে শেষ পর্যন্ত সরকারের স্বার্থটা দেখে নেবার জন্যে রইল কে? পিপিপি উদ্যোগে সরকারের অনন্ত জমি আর অর্থ বিনিয়োগ করার আগে আলাদা করে পিপিপি বা যৌথ উদ্যোগ সংক্রান্ত একটা অর্থনৈতিক অপরাধ (economic crime) নিয়ন্ত্রণ আইন তৈরি করাও তো প্রয়োজনীয় ছিল। প্রত্যেকটি পিপিপি বা যৌথ উদ্যোগে সরকারি-বেসরকারি উভয়-মহলের প্রধান চিন্তক দলের ভূমিকার প্রতিটি পর্যায় লিপিবদ্ধ থাকার প্রয়োজন ছিল যাতে সেই ভূমিকা প্রয়োজনে বিশেষ অর্থনৈতিক অপরাধ দমন আইনের আওতায় বিচার্য হতে পারে। কঠোর আইনের বিশেষ অনুশাসন ব্যতিরেকে দেশের জমিজমা-অর্থ, পিপিপি উদ্যোগের নামে লুটপাট হওয়া অসম্ভব নয়। সরকারি বা আধা-সরকারি প্রতিষ্ঠানের ছদ্ম পরিচয়ে অন্যায় সুবিধে বা ক্রয় সংক্রান্ত বে-নিয়ম ঘটে যাওয়ার ব্যাপারটা রোধ করতে হবে বলে উদ্ধৃতির মধ্যে যে উল্লেখ আছে, পিপিপি সংক্রান্ত অপরাধ দমনের পৃথক আইনের অভাবে সেটি নিতান্তই জোলো এবং দায়সারা বলে চোখে লাগে।

পিপিপি সংস্থার উপহার

এত যে পিপিপি নিয়ে যোজনা কমিশনের উচ্ছ্বাস এবং সরকারি উন্মাদনা, এবার দেখা যাক পিপিপি-র সাফল্য বা ব্যর্থতার আসল অবস্থান ঠিক কোথায়। ভারত সরকারের ডিপার্টমেন্ট অফ ইকনমিক অ্যাফেয়ার্স-এর সচিব অরবিন্দ মায়ারাম গত ৩০ এপ্রিল ২০১৩ FICCI আয়োজিত পিপিপি সংক্রান্ত আলোচনা সভায় বেসরকারি অংশীদারদের পিপিপি প্রকল্প থেকে চুক্তিভঙ্গের কথা উল্লেখ করেছেন। দেখা যাচ্ছে, বেসরকারি বিনিয়োগের খামতি এবং ব্যাঙ্কের ঋণদানে অনাগ্রহ পিপিপি প্রকল্পর অগ্রগতির অন্তরায়। সরকার জমি দেবে, উৎসাহ দেবে নানাভাবে— তার মধ্যে আছে বেসরকারি অংশীদারকে সম্পূর্ণ লাইসেন্স দান, প্রকল্পর পুরো মেয়াদ জুড়ে সম্পূর্ণ অধিকার ও কর্তৃত্বের ক্ষমতাদান (Concessions and

Concession Period)। এছাড়া আছে, প্রকল্প অর্থনৈতিক বিচারে যুক্তিযুক্ত না হলে ঘাটতি নিবারক সরকারি সাহায্য (Viability Gap Funding) ইত্যাদি। এত সব করে জমিজমা দিয়ে দক্ষতা ও নৈপুণ্যগুণসমন্বিত বেসরকারি অংশীদারদের বরণ করে এনে লাভ কী হল? সাম্প্রতিককালে তিনটি জাতীয় সড়ক প্রকল্পে বেসরকারি অংশীদার ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটি অফ ইন্ডিয়াকে (NHAI) চুক্তি বাতিলের নোটিশ দিয়ে বসে আছে— কারণ, আইনগত জটিলতায় সময় মতো কাজকর্ম এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যাচ্ছে না। বেসরকারি এই অভিযোগ NHAI একেবারেই মানছেন না— তাঁরা দাবি করেছেন প্রকল্পয় টাকার যোগান নেই, তাই এসব নিতান্তই ছুতো।[৫] এই একই সভায় যোজনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান মন্টেক সিং আলুওয়ালিয়া জানিয়েছেন— পরিকাঠামোয় বেসরকারি সংস্থাদের বিনিয়োগ যা হবে মনে করা হয়েছিল তার অর্ধেকও যদি না হয় তবে দ্বাদশ পরিকল্পনার মেয়াদকালে যে ৮ শতাংশ জিডিপি বৃদ্ধির হার লক্ষ্যমাত্রা ছিল তা হওয়া অসম্ভব। কারণ সরকারের এসব প্রকল্পে বিনিয়োগ করার ক্ষমতা নেই। বেসরকারি পুঁজিপতিরা জাতীয় সম্পদ গড়ার পবিত্র শপথ নিয়ে আত্মভোলা এক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিজেদের মধ্যে সার্থকভাবে প্রতিস্থাপন করেছে, সরকার কি তবে এরকমই কিছু বিশ্বাস করে বসে ছিল? এত বিচক্ষণ-বুদ্ধিমান চিন্তক দল ঢাকঢোল পিটিয়ে অমুক হবে তমুক হবে ঘোষণা করার সময় বাস্তব অবস্থার ইতিহাসটারই চর্চা করলেন না ঠিকভাবে?

বাস্তব পরিস্থিতির অন্য এক উদাহরণ— দিল্লী মেট্রোর এয়ারপোর্ট এক্সপ্রেস লাইন— যা নগরপরিবহণ প্রকল্পর একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসাবে ধরা হয়। এই প্রকল্প থেকে রিলায়েন্স ইনফ্রাস্ট্রাকচার-এর অধীনস্থ বেসরকারি সংস্থার (DAMEPL) পশ্চাদপসরণ ঘটেছে। জনস্বার্থের কথা মাথায় রেখে দিল্লী মেট্রো রেল কর্পোরেশন (DMRC) মৌলিক নাগরিক পরিকাঠামোর কাজ শেষ করে এক্সপ্রেস লাইন চালু করে দেয়। এরপর বেসরকারি অংশীদারের উপহার— দিল্লী মেট্রো রেল কর্পোরেশন-এর কাছে ৭৯৫ কোটি টাকার ক্ষতিপূরণের দাবিপেশ।[৬] ৫৮০০ কোটি টাকার এই প্রকল্পর শুরু থেকেই গোলমাল। সুরক্ষা সংক্রান্ত ছাড়পত্র পাওয়ায় বিলম্ব বা কারিগরি শৈথিল্য নিয়ে টানাপোড়েন সময়মতো প্রকল্প চালু হওয়ায় বিঘ্ন ঘটিয়েছে। প্রকল্প চালু করার সময় আবার দেখা গেল লোহার গার্ডার নিয়মমাফিক ব্যবহৃত হয়নি। কিন্তু এসবের জন্যে বেসরকারি সংস্থার যেন কোনো দায় নেই। যত দোষ— যারা সুরক্ষার ছাড়পত্র দেবে, কারিগরি ভুলত্রুটি খতিয়ে দেখবে, তাদের। অতএব, ক্ষতিপূরণ! আপাতত এই নিয়ে আইনী লড়াই চলবে।

"এ-সব আনতে কত লণ্ডভণ্ড করনু যজ্ঞ-যাগ"

মধ্য ও পূর্ব দিল্লীর বিদ্যুৎ বন্টন সংস্থা (discom) বেসরকারিকরণের সময় বন্টনে লোকসান কত হবে এবং তার জেরে বেসরকারি সংস্থাটিকে দিল্লী সরকারকে ভর্তুকি দিতে হবে কী পরিমাণ তা নিয়ে প্রচুর চাপানউতোর চলে। সরকার বেসরকারি সংস্থাকে ঋণ দিল— ঋণ প্রথম তিন বছরে শোধ করার প্রয়োজন হল না (moratorium), বন্টনের লোকসান নিয়ে

বচসা, নানাভাবে আয়ের পথ সুগম করার ব্যবস্থা ইত্যাদি ইত্যাদি দর কষাকষি এক দিকের গল্প। অন্যদিকে সম্পদ কুক্ষিগত করার অসৎ প্রচেষ্টা। সম্পত্তির মূল্য অত্যন্ত কমিয়ে ধরা হল। সংস্থার (discom) মোট মালিকানাভিত্তিক মূলধন বিনিয়োগ (equity) হিসাব করে দাঁড়ালো ১১৬ কোটি টাকা। ব্যাপক নেটওয়ার্ক, স্থাবর সম্পত্তি, এবং একচেটিয়া কারবারের অধিকার বেসরকারি হাতে চলে গেল মোট মালিকানাভিত্তিক মূলধনের (equity) ৫১ শতাংশ দখল করে, মাত্র ৫৯ কোটি টাকা বিনিয়োগের পরিবর্তে। দিল্লী বিদ্যুৎ বোর্ডের হিসাবের অডিট এক দশকের উপর সময় ধরে বাকি পড়ে ছিল। সম্পত্তির কোনো বিস্তারিত তালিকা নেই। সম্পত্তির মূল্যায়ন করার জন্যে এই পরিস্থিতিতেও এমনকী কোনো স্বীকৃত ভ্যালুয়ার নিয়োগ করা হল না। কেন্দ্রীয় সরকারের ঘোষিত বিলগ্নিকরণের নীতি অনুযায়ী সম্পত্তির মূল্যায়ন সংক্রান্ত নিয়মের তোয়াক্কা না করে দিল্লী বিদ্যুৎ বোর্ডের প্রচুর ভূসম্পত্তি ৫৯ কোটি টাকার পরিবর্তে বেসরকারি হাতে সঁপে দেওয়া হল।[৭]

এই প্রসঙ্গে নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ জোসেফ স্টিগলিজের একটা মন্তব্য তুলে ধরার লোভ সম্বরণ করতে পারছি না। তাঁর বক্তব্যের মর্মার্থ— বেসরকারিকরণের ব্যাপারে সবচেয়ে উদ্বেগের সচরাচর লক্ষিত বিষয় সম্ভবত দুর্নীতি। সরকারি মহলের তরফে প্রবণতা থাকে সরকারের প্রাপ্য আয় কাটছাঁট করে দেখানোর— তারাই হয় প্রতিষ্ঠানের মুনাফা কমিয়ে দেখায় নয়তো বন্ধুবান্ধব বা নিজের লোকদের কাজকর্ম-বরাত পাইয়ে দেয়। বেসরকারিকরণ হলে, বাজারতত্ত্বের মৌল দর্শন অনুসারে, এসব আর থাকবে না। বাস্তব কিন্তু উল্টো কথাই বলে। ব্যাপারটা এতটাই খারাপ পথে গেছে, মজা করে বলা হয়— 'বেসরকারিকরণ' তো নয়, 'উৎকোচদানকাণ্ড'। সরকার দুর্নীতিপরায়ণ হলে বেসরকারিকরণে এসবের সমাধান হওয়া দুরাশা। ভুললে চলবে না, যারা সরকারি প্রতিষ্ঠান গোল্লায় দিয়েছে তারাই তো বেসরকারিকরণের প্রক্রিয়ার কাণ্ডারী। ("Perhaps the most serious concern with privatization, as it has so often been practiced, is corruption. The rhetoric of market fundamentalism asserts that privatization will reduce what economists call the "rent-seeking" activity of government officials who either skim off the profits of government enterprises or awards contracts and jobs to their friends. But in contrast to what it was supposed to do, privatization has made matters so much worse that in many countries today privatization is jokingly referred to as "briberization". If a government is corrupt, there is little evidence that privatization will solve the problem. After all, the same corrupt government that mismanaged the firm will also handle the privatization.")[৮]

পিপিপি আর যৌথ উদ্যোগের নামে সরকারি ধনসম্পদ কীভাবে হরিলুট হয়ে যেতে পারে তার আর একটা দৃষ্টান্ত তুলে ধরা যাক। ২০০২ সালের ১ জুলাই দিল্লী বিদ্যুৎ বোর্ডেরই তিনটি বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থা অধিগ্রহণ করে বোম্বাই সাবার্বান ইলেক্ট্রিসিটি সাপ্লাই এবং টাটা পাওয়ার। এক হাজার কোটি টাকার বেশি মূল্যের সম্পত্তি গায়েব হয়ে যায়। দিল্লী বিদ্যুৎ

বোর্ডের ৫৪০৩ কোটি টাকার মূলধনী সম্পত্তির জায়গায় দিল্লী সরকারের ২০ নভেম্বর ২০০১ তারিখে বিজ্ঞাপিত হস্তান্তর পরিকল্পনায় মোট স্থায়ী সম্পত্তি ধরা হয়েছে কুল্লে ৪২৬৩ কোটি টাকা মূল্যের। ট্রান্স্‌মিশন সংস্থার ৬৫০ কোটি টাকা এবং জেনারেটিং সংস্থার ৫১০ কোটি টাকা এর অন্তর্ভুক্ত। বাকি ৩১০৩ কোটি টাকা যে তিনটি ডিস্ট্রিবিউশন সংস্থা বেসরকারিকরণ করা হয় তাদের মোট স্থায়ী সম্পত্তির মূল্য। রেগুলেটরি কমিশনের স্বীকৃত অঙ্ক আর দিল্লী সরকারের অঙ্কে ফাঁক থেকে যায় ১১৪০ কোটি টাকার। এর পরেও ৭৩৪ কোটি টাকা জমে থাকা অবক্ষয় মূল্য (accumulated depreciation) হিসাবে বাদ গেল, অর্থাৎ ৩১০৩ কোটিও নয়, হল ২৩৬০ কোটি টাকা। এবার প্রয়োগ করা হল Business valuation method অর্থাৎ ভবিষ্যতের বছর বছর আয়ের সম্ভাব্য অঙ্ককে বর্তমান মূল্যে ধরে নিয়ে সম্পত্তির মূল্যের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া হল (discounted cash flow at present value), যদিও এই পদ্ধতিতে মূল্যায়ন করার সময় জমে থাকা অবক্ষয় মূল্য (accumulated depreciation) ধরার কথা নয়। যাই হোক এত সব অঙ্ক কষে নীটফল দাঁড়াল এইরকম— ইলেক্ট্রিসিটি রেগুলেটরি অথরিটির স্বীকৃত মূল্যায়নের থেকে ১০০০ কোটি টাকা প্রাথমিকভাবে গায়েব হয়ে গেল এবং বেসরকারিকৃত তিনটি বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থার ৫১% মালিকানার অংশ পেতে বেসরকারি ক্রেতা দিল মাত্র ৪৮১ কোটি টাকা। পরিবর্তে বিশাল নেটওয়র্ক, স্থাবর সম্পত্তি, একচেটিয়া কারবারের সুযোগ, এবং বছরে ৭ হাজার কোটি টাকার সম্ভাব্য রেভিনিউ।[৯]

পিপিপি প্রকল্পর সমস্ত মজাটাই এইখানে। সরকারি ব্যবস্থাপনাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে, কাজে লাগিয়ে, টাকা ঢালবো— সেরা দক্ষতা আর মেধা কাজে লাগাবো— এই মন্ত্র আওড়ে কোনোমতে সম্পত্তি হস্তগত করার ব্যবসায়িক কারসাজি এখানে প্রকটভাবে উপস্থিত। মনে রাখতে হবে, সরকারের প্রধান বিনিয়োগের মাধ্যম জমি— যা শুধু দামি নয়, প্রতিনিয়তই তার দাম লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ে চলেছে। যেটা দেখা প্রয়োজন তা এই, প্রয়োজনের অতিরিক্ত এক ছটাকও জমি যেন পিপিপি প্রকল্পকে বরাদ্দ করা না হয়। পিপিপি প্রকল্পে সরকারি অংশীদারের স্বার্থ যেমন ক্ষুণ্ণ হতে দেওয়া যাবে না, তেমনি ক্রেতা বা উপভোক্তার তৃপ্তি আদপে যথাযথ মানে পৌঁছোল কিনা সেটাও খতিয়ে দেখা দরকার। কারণ, পিপিপি প্রকল্প নেবার হেতুটাই তো সর্বসাধারণের সুবিধে বৃদ্ধির খাতিরে, যা শুধুমাত্র সরকারি ব্যবস্থায় সম্ভব হচ্ছিল না। প্রতিটি পিপিপি প্রকল্পে তাই বুঝে নিতে হবে—

ক) সরকারের বিপুল পরিমাণ বিনিয়োগ এবং পরিহার্য ঋণ ছাড়াই জনগণের জন্যে দক্ষ এবং ন্যায্যমূল্যের সম্পদ বা সুযোগ তৈরি করা সত্যিই সম্ভব হল কিনা;

খ) কারিগরি উৎকর্ষ সমৃদ্ধ সৃষ্টিমূলক এমন কিছু কি সত্যিই করা গেল যা উপভোক্তার পক্ষে তৃপ্তিদায়ক বলে প্রমাণিত হল;

গ) সরকারি অর্থমূল্যে বেসরকারি একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠিত হল না তো;

ঘ) সরকারি অংশীদারের ঘাড়ে চাপানো আজকের জামিনের দায় বা অন্য দায় ভবিষ্যতের বিশাল দায়ভারে পর্যবসিত হবে না তো;

ঙ) আরও সস্তায় এবং কম দায়ের জেরে বিকল্প কোনো প্রকল্প সম্ভব ছিল কি যাতে

জনস্বার্থ আরও ভালভাবে রক্ষিত হতে পারতো অথবা যা উপভোক্তার পক্ষে আরও তৃপ্তিদায়ক হতে পারতো;

চ) জাতীয় অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বণ্টনযোগ্য প্রাপ্তি ভাগাভাগির হার যথাযথ কিনা;

ছ) সরকার বেসরকারি হাতে সব কিছু ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্তে বসে আছে, নাকি নিয়মিত যাচাই করে দেখছে তার নিজের স্বার্থ বা উপভোক্তার স্বার্থ বিঘ্নিত হয় এমন কিছু পিপিপি প্রকল্পে চলছে না।

বলাই বাহুল্য, শেষের এই মূল্যায়নটুকু অক্ষুণ্ণ রাখতে গেলে সরকারি নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থায় ছুটি দিয়ে দিলে চলে না। অথচ প্রকৃত অর্থে সেই ছুটি দিয়ে দেবার স্বপক্ষেই যোজনা কমিশন থেকে সুপারিশ করা হয়েছে। এই মূল্যায়ন বা বিচার কিন্তু ধারাবাহিকভাবে পিপিপি সংস্থার কাজকর্ম খতিয়ে দেখার উপর নির্ভরশীল। দ্বিতীয়ত, পিপিপি সম্পর্কযুক্ত বেসরকারিকরণ প্রক্রিয়ায় অর্থনৈতিক অপরাধ নিয়ন্ত্রণের বিশেষ আইনেরও একটা ব্যবস্থা থাকা এ প্রসঙ্গে নিতান্ত জরুরি ছিল। জোসেফ স্টিগলিজের ছোট্ট একটা মন্তব্য এইরকম— এশীয় আর্থিক সঙ্কট ঘটেছিল আর্থিক ক্ষেত্রের আইনী ব্যবস্থার অপ্রতুলতার কারণে, প্রাথমিক আইন-শাসন বলবৎ করার ব্যাপারে ব্যর্থতার ফলে রাশিয়ায় গুণ্ডাবাজী মূলধনী প্রক্রিয়ায়। প্রাতিষ্ঠানিক পরিকাঠামোর তেমন জোর না থাকায় বেসরকারিকরণ প্রক্রিয়ার অন্তর্কালীন অবস্থায় থাকা দেশগুলিকে বেসরকারিকরণ, সম্পদ সৃষ্টির পরিবর্তে বরং সম্পদ-হারা হবার দিক-নির্দেশ করেছে। ("... The Asia financial crisis was brought on by a lack of adequate regulation of the financial sector, Mafia Capitalism in Russia by a failure to enforce the basics of law and order. Privatization without the necessary institutional infrastructure in the transition countries led to asset stripping rather than wealth creation.")[১০]

উর্বর মস্তিষ্ক নয়— উর্বর জমি

পিপিপি ছাঁচের সাম্প্রতিকতম অভিযান শুরু হয়েছে কৃষিক্ষেত্রে। প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং, কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী শরদ পাওয়ার এবং একগুচ্ছ রাজ্যের রাজনীতিবিদদের প্রত্যক্ষ মদতে কনফেডারেশন অব ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রি (CII) নেমে পড়েছে দেশের কৃষিক্ষেত্রে নতুন সবুজ বিপ্লব ঘটিয়ে তুলতে। এদের সবার হাতে অবশ্যই পিপিপি প্রগতির ঝাণ্ডা। ন্যাশনাল কমিশন ফর ফার্মার্স (NCF) কিয়দংশে পিপিপি ব্যবস্থাপনার প্রত্যাশী আগে থেকেই ছিল— যেমন ভূমি-সংস্কার এবং প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ সংগ্রহ— বিশেষত এই দুটি ক্ষেত্রে। কিন্তু এখন যে পিপিপি কৃষিক্ষেত্রে অবতীর্ণ, উৎপাদনে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ থেকে খুচরো বাজারে কৃষিজ পণ্য বিপণন পর্যন্ত সর্বত্র তার ভূমিকা বিস্তৃত। ২০১২ সালের ডিসেম্বর মাসে রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জিকে দিয়ে উদ্বোধন করানো হয় CII-এর পৃষ্ঠপোষকতায় অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় সম্মেলন। এখানেই পিপিপি প্রয়াসে ভারতে দ্বিতীয়বার সবুজ বিপ্লব ঘটানো হবে ঘোষণা

করা হয়। এর কিছুদিন আগে ২০১২ সালের অগাস্ট মাসে কেন্দ্রীয় কৃষি মন্ত্রক এক রূপরেখা তৈরি করে যাতে নানা কৃষিসংক্রান্ত কার্যাবলীকে একত্রিত করে কীভাবে পিপিপি ছাঁচে বেসরকারি পুঁজিপতিদের সাহায্যে বৃহদায়তন কৃষি প্রকল্প গড়ে তোলা সম্ভব, তার ইঙ্গিত দেওয়া হয়। এর উদ্দেশ্য, বড় বড় কৃষক গোষ্ঠীকে একত্রিত করা, এবং কৃষিজ পণ্যের যোগানকে এক জায়গায় জড়ো করা। প্রয়োজনীয় অর্থ আসবে রাষ্ট্রীয় কৃষি বিকাশ যোজনা (RKVY) থেকে রাজ্য সরকারগুলির প্রত্যক্ষ তদারকিতে এবং জাতীয় স্তরের কর্তৃপক্ষের সাহায্যে। কৃষিমন্ত্রকের প্রস্তাবিত রূপরেখায় বলা হয়েছে, সরকার, কৃষক এবং কর্পোরেট সংস্থার পারস্পরিক সহযোগিতায় কৃষিক্ষেত্রের জিডিপি বৃদ্ধি পাবে এবং গ্রামীণ দারিদ্র্য অনেকটাই মোচন করা যাবে। CII আয়োজিত সম্মেলনের সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয়ে যায় স্মল ফার্মার্স অ্যাগ্রিবিজনেস কনসর্শিয়াম (SFAC) নামক জাতীয় স্তরের মূল প্রতিষ্ঠানের পিপিপি প্রয়াসকে জাগিয়ে তোলার ব্যস্ত পদক্ষেপ। SFAC কারিগরি সাহায্য দেওয়া ছাড়াও রাজ্য সরকার এবং কর্পোরেট সংস্থাকে নানাভাবে সাহায্য করবে। কৃষিমন্ত্রকের প্রণালী অনুযায়ী SFAC দেশের বিভিন্ন অংশে ফার্মার প্রোডিউসার কম্পানিজ (FPC) গঠন করার কাজে ২০১৩ সালের জানুয়ারি মাস থেকে নিয়োজিত আছে। কৃষিমন্ত্রকের ব্যাখ্যা অনুযায়ী ৮৩ শতাংশ জমিই হয় প্রান্তিক অথবা ক্ষুদ্রাকার। কৃষকদের প্রাতিষ্ঠানিক সংগঠনের মধ্য দিয়ে উৎপাদকের ভূমিকায় একত্রিত করতে না পারলে যেমন উৎপাদনও বাড়ানো যাবে না, তেমনি যাদের স্বার্থ জড়িত— যেমন মূলত যারা উৎপাদনমুখী কাজে নিযুক্ত, তাদের স্বার্থ রক্ষাও সম্ভব হবে না।

এ পর্যন্ত বেশ তো শুনতে লাগছিল। এইবার গলদ কোথায় দেখা যাক। পিপিপি প্রয়াসে যারা কৃষিক্ষেত্রে ত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন, দেখা যাচ্ছে বহু পুরনো প্রথা যা চাষের ক্ষেত্রে আকছার দেখা যায়, সেই চুক্তির ভিত্তিতে চাষ (Contract farming) এখানেও চলছে। আন্তর্জাতিক কর্পোরেট সংস্থাও চুক্তির ভিত্তিতে চাষ প্রথায় কাজ কারবার চালাচ্ছে, যেখানে বেশির ভাগটাই অলিখিত এবং মৌখিক চুক্তির ভিত্তিতে কার্যকরী হয়। বলাই বাহুল্য ক্ষুদ্র কৃষক সংগঠন এই শক্তিধর কর্পোরেট সংস্থার কাছে ম্রিয়মান হয়ে গিয়ে তাদের আদেশ শিরোধার্য করে নিতে বাধ্য হচ্ছে। ইতিমধ্যেই মহারাষ্ট্র এবং অন্ধ্রপ্রদেশে আওয়াজ উঠতে শুরু করেছে ফার্মার প্রোডিউসার কম্পানিজ-এ কৃষকদের যোগদান করতে বাধ্য করা হচ্ছে এবং তাদের দিয়ে ইংরেজি ভাষায় লিখিত চুক্তিপত্রে সই করানো হচ্ছে যে ভাষা তাদের অবোধ্য।

খটকার আরও একটা জায়গা আছে। কৃষিমন্ত্রকের নির্ধারণ অনুযায়ী নাকি মহারাষ্ট্র, অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক এবং গুজরাট আগ্রহী-রাজ্যসমূহ যাদের পিপিপি পদ্ধতিতে কৃষিক্ষেত্র বিস্তীর্ণ করায় প্রচুর উৎসাহ। যেসব ফলনে আগ্রহ তার তালিকায় আছে আলু, টম্যাটো যা মূলত আচার, চাটনী প্রস্তুতকারক ব্যবসার দিকে তাকিয়ে উৎপাদন করা হচ্ছে। এ ছাড়া আছে তামাক, সূর্যমুখী ফুল, তুলো এবং দুগ্ধজাত পণ্যের উৎপাদন। ধান, গম ইত্যাদি খাদ্যশষ্যে আগ্রহ নৈব নৈব চ। খাদ্যশষ্যের থেকে বাগানজাত দ্রব্যে, পশুপালন সংক্রান্ত কাজে, মুরগী

এবং মৎস্যচাষে জিডিপি বৃদ্ধির হার বেশি, এবং কৃষির অধীন এইসব ক্ষেত্র থেকেই কৃষির মোট জিডিপি-এর ৭৫ শতাংশ অর্জিত হয়। সুতরাং পিছন ফিরে দেখার আর কিছু নেই। জিডিপি-প্রধান অর্থনীতিতে আর ভাবনারও কিছু নেই। চাল, গম এসব শষ্য কে খায়? কৃষিতে পিপিপি প্রকল্পের বাঘা বাঘা বেসরকারি অংশীদার যেমন রিলায়েন্স, এসার, ভারতী এন্টারপ্রাইজেস-দেল মঁত্ প্যাসিফিক, আদানি গ্রুপ, আইটিসি, গোদরেজ, মেরিকো, টাটা কেমিক্যাল্স্, নেস্‌লে— এদের বাড়ির শৌখিন ছেলেমেয়েদের ভাত-রুটি বেশি খেলে শরীর টেঁকে না, মধ্যপ্রদেশ স্ফীত হয়। এদের প্রয়োজনটাই দেশের প্রয়োজন, যে তা না বোঝে সে একটি নিরেট মাথার নির্বোধ। সেখানে— "সেই বনানীর মধ্যে বসে বনের দুলালী মেয়েদের সঙ্গে গল্প করতে আমাদের এত ভাল লাগছিল যে কিছুতেই সেখান থেকে উঠতে ইচ্ছে করে না। ভাত হয়ে গেল, বড় বড় শাল পাতার পাত্রে ফেনসুদ্ধ ঢেলে বিনা নুনে বিনা তরকারিতে দিব্যি খেতে লাগল। বিলাসিতার সর্ব উপকরণ-শূন্য এই সকল অনাড়ম্বর জীবনধারা আমার কাছে এত নূতন, এত অপরিচিত যে শুধু এই দেখবার জন্যে আমি সমস্ত রাত এইভাবে কাটিয়ে দিতে পারি।" (বনে-পাহাড়ে: বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়)— এসব নিতান্তই ছেঁদো কথা মনে করার স্বাধীনতাটুকু গণতন্ত্রে কারোর কারোর থাকবে তো নিশ্চয়ই। দুবেলা একটু ভাতের জন্যে হাহাকার দেশের আনাচে কানাচে আছে নিশ্চয়ই। সেদিকে তাকানোর প্রয়োজন যার আছে তারই থাক। পিপিপি প্রয়াসে ওসব কিছু দেখলে চলে না। এখানে লক্ষ্য জিডিপি বৃদ্ধি, মুনাফা। গরিবি এভাবেই হটবে। তাই খাদ্যশষ্যের ভাবনা পিপিপি সংস্থার নয়।

কিন্তু চাষের নাম করে নেমে আরও যা চলছে আসলে সেও তো জমি দখল। অন্ধ্রপ্রদেশের চিত্তুর জেলায় কুপ্পাম অঞ্চলে গত শতকের নয়ের দশকের শেষের দিক থেকে প্রথম চুক্তির ভিত্তিতে চাষের অভিজ্ঞতায় যৌথ মূলধনী ব্যবসা সংস্থার জমি দখলের প্রয়াস ধরা পড়ে। পাঁচ বছর আগে পর্যন্ত উত্তর প্রদেশ আর পাঞ্জাবেও এ জিনিস দেখা গেছে। বেসরকারি পুঁজিপতিদের দ্বারা চালিত কৃষি-অর্থনীতিতে পিপিপি প্রকল্প বহু ক্ষেত্রেই জমি দখলের অস্ত্র শানাচ্ছে।[১১]

এই রচনাটি লিখতে লিখতেই খবরের কাগজে চোখে পড়ল একটা খবর— ফার্মার প্রোডিউসার কম্পানিজ গঠন করা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার সক্রিয়ভাবে এগোচ্ছেন। কর্পোরেট সংস্থার আবির্ভাব হতে চলেছে অচিরেই। ঠিক কী হবে এখানে অদূরভবিষ্যতেই জানা যাবে হয়তো। উৎকণ্ঠায় ততক্ষণ গলার নলীতে একটা ব্যথা ব্যথা ভাব থাকবেই। কৃষিজমিকে অন্য কাজের জন্যে ব্যবহার করা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের মাথা ফাটাফাটি নতুন করে উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। এখানে বরং অন্য একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। নয়া দিল্লীর আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে গাড়িতে এক ঘণ্টার পথ হরিয়ানা রাজ্যের ঝাজ্‌জার জেলায় পেল্‌পা গ্রাম। পিপিপি ব্যবস্থায় পরিচালিত বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল (SEZ) হিসাবে গ্রামটি চিহ্নিত। এই পিপিপি উদ্যোগে রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ-এর ৯০% এবং হরিয়ানা সরকারের ১০% মালিকানা এবং এদের লক্ষ্য মোট পঁচিশ হাজার একর জমি অধিগ্রহণ যার অবশ্যম্ভাবী

ফল ঝাজ্জার জেলার ২২টি এবং গুরগাঁওয়ের ১৮টি গ্রামের মানুষের বাস্তুচ্যুতি। সব জমিটাই বলতে গেলে কৃষি জমি এবং অত্যন্ত উর্বর। অঞ্চলের কৃষকদের বেশির ভাগের মত— সরকার বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল করার জন্যে যা ব্যয় করছে জলসেচের উদ্দেশ্যে তার সামান্য ভগ্নাংশ ব্যয় করতে রাজী থাকলেও উৎপাদন অভাবিত রকম বাড়তে পারতো। কৃষকদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই কৃষি ত্যাগ করে জমি ছাড়তে রাজী নয় যার ফলে প্রতি একর জমি ২২ লক্ষ টাকা দরেও তারা ছাড়তে রাজী ছিল না। কিন্তু ২০০৫ সালের MOU অনুযায়ী দু' বছরের মধ্যে আইনত সমস্ত জমিটাই রিলায়েন্স্ ইন্ডাস্ট্রিজ পরিচালিত পিপিপি সংস্থার দখলে আসার প্রয়োজন ছিল।[১২]

স্বাস্থ্য অথবা সম্পদ

বহু মূল্যের জমি সস্তায় পাবার জন্যে সরকারের কাছে হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা সম্পর্কিত ভাল ভাল প্রস্তাব কত যে জমা পড়েছে ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে— তার ইয়ত্তা নেই। কলকাতায় নতুন উপনগরী— ইস্টার্ন মেট্রোপলিটন বাইপাস ধরে বহুমূল্য জমি NRI ডাক্তারকুল আর বড় বড় ব্যবসাদারী প্রতিষ্ঠানের হাতে গরীবের চিকিৎসার সুবন্দোবস্তর লোক দেখানো নানা শর্তে গত পঁচিশ-তিরিশ বছরে কখনো এক টাকায় কখনো বাজার দরের তুলনায় অভাবিত কম মূল্যে তুলে দেওয়া হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে সরকারের অংশীদারীও একেবারেই নেই। কী অপূর্ব জনদরদী— দরিদ্র স্বার্থ রক্ষায় সদা উন্মুখ এসব হাসপাতাল! একটু খেয়াল করলেই ঢাকুরিয়া ব্রীজের পাশে নিরাময় হাসপাতাল নামের একটা হাসপাতালের কথা পাঠকদের মধ্যে অনেকেই মনে করতে পারবেন। বেসরকারি সেবীর দল চালাতে পারেননি। সরকার প্রশাসক (Administrator) বসালেন, কিছুদিন চালালেনও। কিন্তু জনদরদী সরকার ততদিনে দর্শন পাল্টেছেন, সেবার জন্যে সেবা বরং আটকে থাকুক গোড়া থেকেই যেগুলো সরকারি হাসপাতাল তাদের ক্ষেত্রে। সরকারের মালিকানায় কিছু অংশ থাকল। বেসরকারি হাতে সিংহভাগ। সরকারি কর্মচারী এখানে হস্তান্তরের দলিল আর চুক্তি অনুযায়ী চিকিৎসার কিছু সুবিধে পেতে পারেন। দুঃখের কথা এ বিষয়ে যাঁদের জানাশোনা ছিল তাঁরা সরকারি চাকরি থেকে বেশির ভাগই ইতিমধ্যে অবসর নিয়েছেন। এখনকার প্রজন্ম তাঁদের আদৌ সুবিধে মিলতে পারে কিনা, মিললেও কেমন তার ওজন এ ব্যাপারে অজ্ঞ। বছর ঘুরে গেছে, ঘটে গেছে বড়সড় দুর্ঘটনাও। দারোয়ানরা গেট খুলে রোগীকে হাসপাতালের বাইরে বের করতে পারেন না, যতই পিছনে তাড়া করুক বিধ্বংসী আগুন। রোগী একবার বেরিয়ে গেলে বিল মেটানোর নিশ্চয়তা কোথায়? কে বাঁচল, কে মরল, হাসপাতালের নিষ্ঠুরতা— দেখেশুনে সব কিছুর মাঝে হতাশায় লোকে বলে ওঠে, বড়লোকের হাসপাতালের কী অমানুষিক ব্যবস্থা! বড়লোকের হাসপাতালটা পিপিপি-র রাস্তা বেয়ে দিব্যি কেমন মহীরূহের আকার নিয়ে নিল ফাঁক-ফোকর খুঁজে, আর হয়ে বসল আদতে অধিগৃহীত সরকারি হাসপাতালের ভূ-সম্পত্তির মালিক সে কথা এখন কোন্ অতলে তলিয়ে গেছে।

উদাহরণের পাহাড় জড়ো করে দেখানো এই প্রবন্ধর উদ্দেশ্য নয়। ৭৪৫ শয্যাবিশিষ্ট

একটা টিবি হাসপাতাল ছিল দক্ষিণ কলকাতার শহরতলীতে। সমাজের ভালর জন্যে সেখানে বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ হয়েছে। টিবি হাসপাতালের বিশাল মেন বিল্ডিং সমেত বেশির ভাগ জমি-বাড়ির দখল নিয়ে সরকারকে কৃতকৃতার্থ করে একদিকে ক্যাপিটেশন ফি নিয়ে ছাত্র ভর্তি চলছে অন্যদিকে চলছে রোগীকে মোটা টাকার বিনিময়ে চিকিৎসাদানের মহাযজ্ঞ। পিপিপি-র উদ্দেশ্যটা এক্ষেত্রে কী ছিল? সরকারের সোজা পথে বিক্রী করা অনেক ভাল ছিল না কি? কোন্ গরীব মানুষটার এখানে সস্তায় চিকিৎসা হয়েছে?

আরও একটা হাসপাতালের কথা মনে করিয়ে দেবো? তাহলে চলুন স্ট্র্যান্ড রোড ধরে উত্তর কলকাতা বরাবর..., না থাক। আমার উদাহরণ প্রদর্শনের উদ্দেশ্য নেই, আগেই যখন বলেছি। তবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেই কথাটাই মাথা থেকে আমি বাদ দিতে পারি না। সরকার বস্তুটা সত্যিই এক ধরনের জড় পদার্থ!

সব দিক খতিয়ে দেখে মনে হয় যে কোনো পিপিপি-ই সত্যিই স্বাগত কিনা আরও ভেবে বলার প্রয়োজন। পিপিপি প্রয়াসগুলির দিকে তাকিয়ে দেখলে একটা জিনিস পরিষ্কার হয়— সাধারণ পরিকাঠামো গড়ার ক্ষেত্রে হোক, স্বাস্থ্যক্ষেত্রে বা কৃষিকার্যে, পিপিপি প্রকল্পর বেসরকারি অংশীদারের চোখ কিন্তু আদতে ওই জমি অধিকারের দিকেই নজর করে বসে আছে।

একটা মজার কথা, পঞ্চায়েত ভোটে এত মানুষ মরে— প্রায় সব পর্যায়ের ভোট নিয়ে চলে মারপিট-দাঙ্গা। কারা করছে এসব? কোনো একটা দলের জামা গলিয়ে নিয়ে যত নিচুতলার কর্মী। আমি তাত্ত্বিক দিক থেকে উদারনীতির ঘোর বিরোধী হয়েও বাস্তবে উদারনৈতিক লেনদেন করতে (deal বললে বোধহয় আরেকটু পরিষ্কার হয়) পিছ-পা নই। আমি মৌলবাদীদের মদতদাতা বলে বাজারে যারা প্রচার চালায় দেশের ভাল করার ব্যাপারে জমি জমা বিলি ব্যবস্থায় টাকা পয়সার লেনদেনে তাদের সঙ্গে আমার কার্যকলাপে-বিশ্বাসে বিরোধ নেই। এই তো আসলে উপরমহলের বারমাস্যা। রাজনীতির আঙিনায় এদের মিছিমিছি খেলায়, পরস্পরের প্রতি অগ্নিবর্ষণে অন্য লোক বিভ্রান্ত হতে পারে, তারা কিন্তু নিজেদের মধ্যে লেনদেন, সৌহার্দ্য পুরোপুরি বজায় রেখে চলে। আর সরকার— আরও আরও বিব্রত হয়।[১৩]

শেষ কথা

এই নিবন্ধ শুরু করা হয়েছিল পিপিপি প্রকল্পে সিএজি'র ভূমিকা দিয়ে। শেষ করার আগে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নেওয়া যাক প্রাক্তন সিএজি মহাশয় কেন অমন মনের ইচ্ছে প্রকাশ করলেন আর কী ভূমিকাই বা বর্তমানে সিএজি দপ্তর পালন করে। পিপিপি সংস্থাটি প্রায়শ একটি বেসরকারি সংস্থা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ফলত সিএজি দপ্তর সেই সংস্থার (Special Purpose Vehicle) নিয়মিত অডিট করার সুযোগ পায় না, এ কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। পিপিপি-র ক্ষেত্রে সিএজি'র ভূমিকা সীমাবদ্ধ— এমন সংস্থা প্রতিষ্ঠা করাটা সরকারের পক্ষে যুক্তিযুক্ত হয়েছে কিনা এবং তা জনহিতকর উদ্দেশ্যে কিনা সেই বিষয়টুকুর

চর্চার মধ্যে। কিন্তু সত্যি সত্যিই এখানে সিএজি-র পক্ষে কতটুকু সম্ভব? কমিটি অন ইনফ্রাস্ট্রাকচার পিপিপি সংক্রান্ত নীতি ও নিয়মকানুন নির্ণয় করে, যার চেয়ারম্যান প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং। অন্য সভ্যদের মধ্যে আছেন অর্থমন্ত্রী, যোজনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান, সংশ্লিষ্ট পরিকাঠামো সম্পর্কিত মন্ত্রকগুলির ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীগণ এবং যোজনা কমিশনের দুজন সদস্য। এছাড়াও আছে পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ অ্যাপ্রেজাল কমিটি (PPPAC) যারা আগেই খতিয়ে দেখে নেয় প্রত্যেকটি পিপিপি প্রকল্প সংক্রান্ত প্রস্তাব, আনুমানিক কাজের প্রণালী ও মান, সম্ভোগকারীর দিক থেকে বিবেচ্য বিষয়সমূহ, সরকারি অর্থাগম এবং অননুমেয় দেনা সংক্রান্ত খুঁটিনাটি। পিপিপি প্রকল্পের মূল্যায়ন করার উদ্দেশ্যে গঠিত এই অ্যাপ্রেজাল কমিটিতে ডিপার্টমেন্ট অব ইকনমিক অ্যাফেয়ার্স-এর সচিব চেয়ারম্যান। অন্য সভ্যদের মধ্যে থাকেন যথাক্রমে যোজনা কমিশনের, ডিপার্টমেন্ট অব এক্সপেন্ডিচারের, ডিপার্টমেন্ট অব লিগাল অ্যাফেয়ার্স-এর সচিবগণ এবং যে ডিপার্টমেন্ট বা বিভাগ থেকে পিপিপি-র প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছে তার সচিব। বিত্তমন্ত্রক (Ministry of Finance) সব ক্ষেত্রেই দেখে নেবে প্রকল্পর জন্যে যে বিশেষ ছাড় বা জামিন সরকারের পক্ষে দেওয়া হয়েছে, এই বিনিয়োগে সরকারের তরফে যে ঝুঁকি নেওয়া হয়েছে, ব্যাঙ্কের আনুমানিক অংশগ্রহণের সম্ভাবনা ইত্যাদি ইত্যাদি বিষয় যথাযথ কিনা। বলা বাহুল্য, এ সবই কাগুজে মূল্যায়ন। বিভিন্ন সরকারি স্তরে এইসব কাগুজে মূল্যায়ন শেষ করার পর সিএজি-কে বলা হল— ভাই হে, তুমিও একবার দেখ। এই হল দেশের সর্বোচ্চ অডিট কর্তৃপক্ষর জনস্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখতে পিপিপি সংক্রান্ত প্রকল্পে ভূমিকা। হাজার হাজার কোটি টাকা সরকারি বিনিয়োগের পরেও— হাজার হাজার একর জমি ও বহুমূল্য ভূ-সম্পত্তি পিপিপি সংস্থায় ব্যবহার করার সুযোগদানের পরেও সেই সংস্থার কাজকর্মে উঁকি মারার সুযোগ নেই সিএজি-র। শুধু সিএজি নয়, পিএসি (Public Accounts Committee), পিইউসি (Public Understanding Committee) কেউই যাতে ধারে কাছে ঘেঁষতে না পারে যোজনা কমিশন কীভাবে তার ব্যবস্থা গোড়াতেই করে রেখেছে— সে আলোচনা আগেই করা হয়েছে। আসল ফাঁক-ফোকর, ত্রুটি ঘটে কাজের ক্ষেত্রে। সেখানেই যদি কিছু দেখার সুযোগ হল না তবে সব কিছু ঠিকঠাক আছে বলার সুযোগ কোথায়? তাই প্রাক্তন সিএজি-র মন্তব্যে কোনো অনাস্থার ইঙ্গিত থাকলে পিপিপি প্রকল্পর ব্যাপারে মানুষের আস্থা অর্জনের পথেই বরং সরকারের পা বাড়ানো উচিত। ❑

টীকা ও তথ্যসূত্র:

১. An Uncertain Glory – India and its contradictions – Jean Dreze & Amartya Sen, Allen Lane, an imprint of Penguin Books, Printed in New Delhi, 2013, pg. 10

২. এই অর্থাঙ্ক ও তথ্যগুলি গজেন্দ্র হলদিয়া লিখিত Infrastructure at Crossroads – The Challenges of Governance (Oxford University Press – 2011) গ্রন্থের Prologue থেকে নেওয়া হয়েছে।

৩. ভারত সরকারের প্রেস ইনফর্মেশন ব্যুরো ২৭ ফেব্রুয়ারী ২০১৩ তারিখের PIB Release/DL/215 থেকে সংগৃহীত।

৪. এটি The Secretariat for the Committee on Infrastructure, Govt. of India প্রকাশিত "Guidelines for Formation, Approval and Approval of PPP Projects"-এর ভূমিকা থেকে উদ্ধৃত। লেখক গজেন্দ্র হলদিয়া।

৫. The Times of India, TNN, April 2013, 04:31AM IST – Govt. cannot bail out faltering PPP Projects: Official

৬. Business Standard, Wednesday, July 24, 2013 – 08:37 PM IST – What is wrong with PPP in India?

৭. গজেন্দ্র হলদিয়া লিখিত ২ নং সূত্রে উল্লিখিত গ্রন্থের ২৫ সংখ্যক অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

৮. Globalization and its discontents – Joseph Stiglitz, Penguin Books India, New Delhi, 2003, pg. 58

৯. গজেন্দ্র হলদিয়া লিখিত ২ নং সূত্রে উল্লিখিত গ্রন্থের ২৭ সংখ্যক অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

১০. ৮ নং সূত্রে উল্লিখিত গ্রন্থ— pg. 220

১১. Frontline, Volume 30, Number 14, July 13-26, 2013 পত্রিকায় ভেঙ্কিটেশ রামকৃষ্ণণ-এর নিবন্ধ Calling in the Corporates থেকে তথ্য সংগৃহীত।

১২. Churning the Earth – The Making of Global India, Aseem Srivastava, Ashish Kothari, Penguin Viking, New Delhi, 2012, pg. 4

১৩. এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, গজেন্দ্র হলদিয়া ভারত সরকারের ডিপার্টমেন্ট অব ইকনমিক অ্যাফেয়ার্স-এর প্রাক্তন যুগ্ম সচিব। তিনি পিপিপি সম্পর্কিত বিষয়ের তত্ত্ব ব্যাখ্যা করে, দলিল-দস্তাবেজ প্রস্তুত করে প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী মনমোহন সিং এবং তাঁর উত্তরসূরী যশোবন্ত সিনহা (ভিন্ন এবং সাধারণ্যে পরস্পর বিরোধী বলে ঘোষিত দুই রাজনৈতিক দলের দুই প্রতিনিধি) দুজনেরই আস্থাভাজন হয়েছিলেন। ২ নং সূত্রে উল্লিখিত তাঁর গ্রন্থে এই অর্থমন্ত্রীদ্বয়ের মন্তব্যেই তা পরিস্ফুট। বলা নিষ্প্রয়োজন, বেসরকারিকরণ প্রক্রিয়ায় এঁদের দুজনের ব্যক্তিগত কিংবা দলগতভাবে তেমন বিরোধ নেই বলেই গজেন্দ্র হলদিয়া মহাশয় সর্বজনমান্য। পশ্চিমবঙ্গের শাসকগণ রাজনৈতিকভাবে অন্য আদর্শে বিশ্বাসী হয়েও উল্লিখিত প্রসঙ্গে যে পথে হেঁটেছিলেন সেটা খুব কিছু ভিন্ন পথ বলে বোধ হয় না। এক্ষেত্রে আরও লক্ষ্যণীয় টেন্ডার ডেকে সর্বোচ্চ দাম পাওয়া গেছে এই অজুহাতে, জলের দরে হোটেল যাদের হাতে তুলে দেওয়া হল সেই হোটেল চেন-এর মালিক রাজ্যসভার সদস্য হয়েছিলেন যাদের ভোটের জোরে, তারা তো সাম্রাজ্যবাদী শক্তির দালাল এবং মৌলবাদী শক্তির মদতদাতা! রাজনীতির এসব মিছিমিছি খেলা কবে সাধারণ মানুষের বোধগম্য হবে?